বালাকোট : আযাদীর প্রথম শাহাদাতগাহ

তানযীল আহমাদ
যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ
tanzilahmad.bd96@gmail.com

আজ ৬ই মে। ১৮৩১ সালের এই দিনে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের দুই দিকপালের নেতৃত্বে বালাকোটের ঐতিহাসিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সে যুদ্ধ ছিল পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ জাতিকে স্বাধীনতার স্বাদ ফিরিয়ে দেয়া, আত্মগ্লানি মুছে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শেখা, অধঃপতিত মুসলিম সমাজের গেন্দরবময় ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবিত করা আর গাদ্দারির বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করা। মূলত ভারতবর্ষে সুদীর্ঘকালব্যাপী মুসলিম শাসনের সোনালী অধ্যায় বাদশাহ আলমগীরের (১৬৫৯-১৭০৭ খ্রি.) পরেই ম্লান হতে থাকে। ষোড়শ শতকে যখন ইংরেজরা থিতু হতে পারেনি তখনো কিছু মুসলিম মেয়েকে তাদের বণিক ও শাসকদের অন্দরমহলে পাওয়া গেছে। নৈতিকভাবে চরম অবক্ষয়ের মুখে পড়তে হয় মুসলিম সমাজকে। তারা তখন প্রকাশ্যে মদ্যপানকেও খারাপ চোখে দেখতো না। হিন্দুদের পূজা- পার্বণে অংশগ্রহণ করত বল্গাহীনভাবে। আবার শিরক বিদআতের সয়লাব ছিল সর্বত্র। কবর পূজারীরা নিজস্ব নতুন শরীয়ত বানিয়েছিল কবর মাজার কেন্দ্রিক। শিয়া রাফেজিদের দৌরাত্ম্যে ঈমান ও আকিদায় বেসামাল হয়েছিল সাধারণ মুসলমানরা। এদিকে ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর আম্রকাননে মীর জাফর, জগৎশেঠ, রায়বল্লভদের গাদ্দারীর কারণে উপমহাদেশের স্বাধীনতা হাতছাড়া হয়ে ইংরেজদের হাতে চলে যায়। ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে মীর কাসেমের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পুরোপুরিভাবে ক্ষমতায় বসে। শুরু হয় পরাধীনতার শিকলবন্দী ইতিহাস। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই শাসকরা হন শাসিত, ব্রিটিশ সরকারের অনুকম্পার ভিখারি। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন মুসলিমরা। ব্রিটিশ শাসনের পূর্বসূরী ছিল তারা। ফলে অবহেলার খড়্গ নেমে আসে মুসলিমদের উপরেই বেশি। এক আইনের মাধ্যমেই মুসলিমদের লক্ষ লক্ষ একরের লাখেরাজ সম্পত্তি দখল করে নেয় ব্রিটিশ সরকার। মক্তব, মাদ্রাসা, মসজিদ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হয়ে পড়ে অর্থশূণ্য। আদালতে ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজি ভাষার প্রচলন হয়। ফলে এক রাতেই হাজার হাজার কেরানী, পেশকার এবং সরকারী কর্মচারী চাকরি হারিয়ে পথে বসে পড়েন। অন্যদিকে, মুসলিমদের ঈমান- আকিদা, তাহযীব- তামাদ্দুনের নৈতিক জায়গায় দেখা যায় চরম খরা। মোটকথা, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি যেগুলো একটি জাতির মৌলিক প্রসঙ্গ এবং তার গৌরবের পরিচায়ক, সেসবের সবটাতেই মুসলিমরা হয়ে পড়ে কোনঠাসা, দেউলিয়া, দিশেহারা। এই দুরবস্থার কথা ভারতগৌরব হুজ্জাতুল ইসলাম শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলবী (১৭০৩-১৭৬২ খ্রি.) তার দূরদর্শিতা দিয়ে অনেক আগেই টের পেয়েছিলেন। তিনি মুসলিম জাতিসত্তার হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য গভীরভাবে ভাবতে থাকেন। তিনি তার গভীর দর্শন দিয়ে চলমান পরাজয়ের কারণ ও এর প্রতিকারের ব্যবস্থা তুলে ধরেন জাতির সামনে। তার দর্শনের মৌলিক সারনির্যাস হলো, এক. মুসলিমদের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে হলে তাদেরকে প্রথম যুগের ইসলাম চর্চা করতে হবে এবং হিজরি প্রথম শতকের পরবর্তী সময় থেকে আজ পর্যন্ত ইসলামের মধ্যে যে কুসংস্কার, ভিন্ন ধর্মের অনুকরণপ্রিয়তা ও ভেজাল প্রবেশ করেছে তা বর্জন করতে হবে। দুই. প্রবল ঈমানী চেতনা সমৃদ্ধ পরিবেশে প্রতিটি মুসলিম সন্তানকে লালিত পালিত হবার উদ্যোগ নিতে হবে। তিন. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের বিভিন্ন স্কুল অফ থটের মধ্যকার বিরোধ যথাসম্ভব

কমিয়ে এনে সবাইকে জাতীয় স্বার্থে এক হতে হবে। শাহ সাহেবের এই দূরদর্শী কর্মপন্থা মুসলিমদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে দ্রুততার সাথে। তারই সন্তান শাহ আব্দুল আজিজের দীক্ষাপ্রাপ্ত সৈয়দ আহমাদ বেরেলির নেতৃত্বে শুরু হয় জিহাদ আন্দোলন। এই আন্দোলনে তার হাতে বাইয়াত করে সেইসব তরুতাজা প্রাণ যারা ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত এবং জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গীত। শাহ সাহেবের খান্দানের দুইজন শীর্ষ আলেম শাহ ইসমাইল শহীদ ও মওলানা আব্দুল হাই আহমাদ বেরেলির হাতে বাইআত করলে এই আন্দোলনে জনস্রোত নেমে আসে। শুরু হয় পরাধীনতার বিরুদ্ধে জিহাদের নতুন অধ্যায়। দলে দলে মানুষ এমনকি বিভিন্ন এলাকার জমিদাররাও সৈয়দ সাহেবের হাতে বাইয়াত করেন। যদিও এদের অনেকেই ক্ষমতার জন্য পরবর্তীতে তার সাথে ছলচাতুরি করে। সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী (১৯১৩-১৯৯৯ খ্রি.) লিখেছেন, "তিনি তাবলীগী ও সংস্কারমূলক সফর শুরু করেন। সর্বাগ্রে মুযাফফরনগর ও সাহারানপুরের ঘনবসতিপূর্ণ ঐতিহাসিক শহরতলী ও পল্লী অঞ্চল, অভিজাত মুসলিম এলাকা এবং উলামায়ে কেরামের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রসমূহ, নিজগড়, মুক্তেশ্বর, দোয়াবার এলাকাগুলো, রামপুর, বেরেলি, শাহজাহানপুর এবং আরো অন্যান্য অঞ্চল সফর করেন। এসব এলাকায় শত শত খানদান ও ব্যক্তিবর্গ এবং উলামাযয়ে কেরাম, মাশায়েখগণ শিরক বিদআত পরিত্যাগ করে তার ভক্ত হন।"

হিজরত : ১৮২৬ সালের ১৭ই জানুয়ারি নিজ জন্মভূমি রায়বেরেলিকে বিদায়ী সালাম জানিয়ে তিনি আল্লাহর দ্বীনের জন্য বেরিয়ে পড়েন। পথে তার সাথে অসংখ্য ভক্ত সহযাত্রী হয়। সবার হৃদয়ে প্রবল আকাঙ্খা, পর্বতসম দৃঢ় মনোবল, ব্রিটিশ ও স্থানীয় গাদ্দারদের পরাজিত করে পুরো ভারতবর্ষে খেলাফতে রাশেদার অনুকরণে ইসলামী শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করা। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে মালব, রাজপুতানা, দোয়াব- এর পাহাড়–পর্বত, নদী- নালা বন- জঙ্গল অতিক্রম করে তিনি কাফেলাকে সম্মুখে নিয়ে যান। এ সময় তার সহযাত্রীর সংখ্যা ছিল ছয়শ জন। পথিমধ্যে বেশ কিছু যুদ্ধ হয়। প্রায় সবগুলো যুদ্ধেই এই কাফেলা বিজয়ী হন। পেশোয়ার, আফগানিস্তান, আকুরা, কাশ্মীর, গজনীসহ বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি সফর করেন এবং এতদঅঞ্চলের অসংখ্য মানুষ তার হাতে ইসলামী রাষ্ট্রের আমির হিসেবে বাইয়াত করেন।

ইমারতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা এবং বাইয়াত গ্রহণ: ১৮২৮ সালের ১৩ই জানুয়ারি সৈয়দ আহমাদের হাতে হাত রেখে অসংখ্য মানুষ ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে বাইয়াত বা শপথ গ্রহণ করেন। এই সংবাদ দ্রুত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের স্থানীয় শাসকগণ আনন্দচিত্তে তার সাথে দেখা করে বাইয়াত করেন। এতে করে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হয়। এই ব্যবস্থার অধীনে রাষ্ট্রীয়ভাবে বাইতুল মাল প্রতিষ্ঠা করা হয়, যাকাত আদায়ের কর্মচারী নিয়োগ করা হয়, বিচারপতি ও পুলিশ নিয়োগ দেয়া হয়। মোটকথা, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যা যা প্রয়োজন তার সবকিছুই এই নবগঠিত রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সৈয়দ আহমাদের লক্ষ্য ছিল স্থানীয় উপজাতি ও শিখদের দমন করে মুসলিমদের শক্তিশালী করা এবং পর্যায়ক্রমে ইংরেজদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়া। সে লক্ষেই তিনি তার যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করছিলেন।

শাহ ইসমাইল শহীদের অবদানঃ সৈয়দ সাহেবের প্রধান সেনাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন শাহ ওলিউল্লাহর পুত্র শাহ আব্দুল গনীর সন্তান তেজস্বী আলেমে দ্বীন ও বীরপুরুষ শাহ ইসমাইল শহীদ। যিনি মাত্র ষোল বছর বয়সেই তার চাচা শাহ আব্দুল আজিজের নিকটে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। একই সাথে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। শিরক ও বিদআতের বিরুদ্ধে সে সময়ে সবচেয়ে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ছিলেন মাওলানা ইসমাইল শহীদ। তার উল্লেখযোগ্য ছাত্র ছিলেন মাওলানা এনায়েত আলী; যিনি তার আপন ভাই মাওলানা বেলায়েত আলীকে সাথে নিয়ে বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে আহলে হাদীস মতাদর্শের বিস্তৃতি ঘটান এবং ইংরেজ বিরোধী জিহাদের অনেকগুলো কেন্দ্র স্থাপন করেন। সৈয়দ আহমাদের কাফেলায় অনেক মুজাহিদ শিরক ও বিদআতের সাথে জড়িত ছিলেন। অনেকের পর্যাপ্ত শরঈ জ্ঞান ছিল না। শাহ ইসমাইল শহীদ তাদেরকে বুঝান যে, শিরক- বিদআতকে পরিত্যাগ না করলে আল্লাহ তা'আলা এই আন্দোলনে বরকত দিবেন না। কাজেই সমস্ত অজ্ঞতা, কুসংস্কার, শিরক- বিদআত বর্জন করে কেবল কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ইবাদত- বন্দেগী ও আন্দোলনের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করলে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য আসবে। তার হৃদয়গ্রাহী ও অগ্নিঝরা বক্তব্যের ফলেই মূলত জিহাদী কাফেলার প্রায় সকলেই শিরক- বিদআত বর্জন করেন। কাজেই একথা বলা যায় যে, বালাকোট আন্দোলন কেবল একটি জিহাদি আন্দোলন ছিল না বরং বিশুদ্ধ দাওয়াতেরও প্লাটফর্ম ছিল। অর্থাত, পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বিপ্লবের সমূহ রসদ এই মুবারক জামাআতের সাথে ছিল এবং সে কারণেই এই আন্দোলন আজও প্রাসঙ্গিক।

আঞ্চলিক নেতাদের গাদ্দারী : বালাকোট রণাঙ্গনে পৌঁছার পূর্বে সৈয়দ আহমাদ সাহেব উত্তর পশ্চিম সীমান্তের বেশ কিছু আঞ্চলিক নেতাদেরকে তার দাওয়াত পৌঁছান। প্রাথমিকভাবে অনেকেই সেই দাওয়াত গ্রহণ করেন ও তার হাতে বাইয়াত করেন, কিন্তু সুদীর্ঘকালব্যাপী সামাজিক রীতিনীতি ও দেশাচার পরিত্যাগ করে ইসলামী হুকুমতকে মেনে নেওয়ার মতো সৎসাহস তাদের ছিল না। ফলে অনেকেই মুজাহিদদের সাথে প্রতারণা করে। যেমন খাবে খানের ভাই আমির খান আফগানিস্তানের ইয়ার মোহাম্মদ খানের সাথে মুজাহিদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। সৈয়দ সাহেব ইয়ার মোহাম্মদ খানের সাথে একান্ত আলাপচারিতায় যেকোনো ধরনের অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে নিষেধ করেন, কিন্তু তিনি সেই নিষেধের তোয়াক্কা না করে মুজাহিদ বাহিনীর সাথে যায়দা নামক স্থান যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। সে যুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনী অত্যন্ত ধৈর্য ও বিচক্ষণতার সাথে যুদ্ধ করে বিজয় লাভ করেন। এরপর পেশোয়ারের নিকটবর্তী অঞ্চলে সুলতান মোহাম্মদ খানের সাথে মায়ার যুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনী জড়িয়ে পড়েন, সে যুদ্ধেও তারা জয়লাভ করেন। অতঃপর পেশোয়ার অভিমুখে রওয়ানা হয়ে সেখানের বিভিন্ন আঞ্চলিক শাসকদেরকে তিনি একত্রিত করার চেষ্টা করে যান। এভাবে করে সৈয়দ সাহেব যেখানে গিয়েছেন সেখানেই মুসলিমদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করে গেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, মুসলিম নেতারা তাদের ক্ষমতার বলয়কে পোক্ত করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি।

বালাকোট রণাঙ্গনে : পেশোয়ার বিজয়ের পর কাশ্মীর বিজয়ের জন্য মুজাহিদ বাহিনী প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। কাশ্মীরের পথে পাঞ্জেতারের নিকটবর্তী কাগান উপত্যকার মুসলিমগণ শিখদের কর্তৃক জুলুমের শিকার হচ্ছিল। তারা সৈয়দ সাহেবের সাহায্য চেয়ে বারবার চিঠি লিখছিল। আর কাশ্মীর যাবার সবচেয়ে সহজতম পথ ছিল বালাকোট প্রান্তর দিয়ে গমন করা। বিখ্যাত কাগান উপত্যকার দক্ষিণ মুখে বালাকোট প্রান্তর অবস্থিত। এর

চারিদিকে সুউচ্চ পাহাড় এবং সম্মুখভাগে কুনাহার নদী প্রবাহিত। ১৭ই এপ্রিল ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে মুজাহিদ বাহিনী কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়ে বালাকোটে পৌঁছে। রাজকুমার শের সিংহ (রঞ্জিত সিংহের ছেলে) সংবাদ পেয়ে তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে বালাকোটের অনতিদূরে মাটিকোট পর্বতমালায় শিবির স্থাপন করে। এরপর স্থানীয় অধিবাসীর সহযোগিতায় ৬ই মে বালাকোটের পার্শ্ববর্তী পল্লীতে এবং বালাকোটের পুরো প্রান্তরে নেমে এসে একযোগে শুরু করে মুজাহিদ বাহিনীর উপরে গুলি বর্ষণ ও হামলা। মুজাহিদ বাহিনীও আল্লাহর উপর ভরসা করে প্রতিরোধ শুরু করে। তুমুল যুদ্ধ শেষে মুজাহিদ বাহিনীর অধিকাংশই শাহাদাত বরণ করেন। নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের আমীর সৈয়দ আহমাদ এবং তার প্রধান সেনাপতি শাহ ইসমাইল শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন।

ব্যর্থতার কারণ : বালাকোট আন্দোলন সাময়িকভাবে ব্যর্থ হলেও তা ছিল আযাদীর প্রথম সবক। পরবর্তী প্রজন্ম বালাকোটের চেতনা ধারণ করেই স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, জীবন দিয়েছে অকাতরে, নির্বাসিত হয়েছে কালাপানির আন্দামানে, ফাঁসির রশি গলায় নিয়েছে হাসিমুখে। তবুও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর সাময়িক ব্যর্থতার কারণ পর্যালোচনা করলে আমরা যা পাই তা হলো, ১. স্থানীয় গোত্রপতি ও সর্দারদের ইসলামী হুকুমতের সামনে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃতি, ২. কতিপয় লোভী আলেমের বিরুদ্ধবাদীদের সাথে হাত মেলানো, কারণ সৈয়দ সাহেবের ইমারত মেনে নিলে তাদের ধর্মব্যবসা মাঠে মারা যাবে, ৩. শিখদের প্রবল বিরোধীতা এবং এই আন্দোলনকে থামাতে ইংরেজদের সাথে হাত মেলানো, ৪. পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর অভাব। এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদ বাহীনির কেউ কেউ ছিলেন আনাড়ি, আবেগের বশবর্তী হয়ে তারা অংশগ্রহণ করেছিলেন, ৫. আধুনিক সমরাস্ত্রের অভাব।

শেষ কথা: বালাকোটের রক্তাক্ত ময়দান পরবর্তীতে ভারতবর্ষের আযাদী আন্দোলনের সূতিকাগার হিসেবে বিবেচিত হয়। কারণ এই জিহাদ আন্দোলন থেকেই দীক্ষা গ্রহণ করে পরবর্তীতে সিপাহী বিদ্রোহ, রেশমি রুমাল আন্দোলন, সীমান্ত অঞ্চলে জিহাদ আন্দোলন, ওহাবী আন্দোলন, ফরায়েযী আন্দোলন, তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার আন্দোলন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলনগুলো পরিচালিত হয়েছে। ১৮২৬ সালের ১৭ই জানুয়ারি রায়বেরেলি থেকে যে ঐতিহসিক সফর শুরু হয়েছিল তা ৬ই মে বালাকোটে বিপর্যস্ত হলেও ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থেকেছে। বরং শহীদানে বালাকোট সৈয়দ আহমাদ বেরেলি এবং শাহ ইসমাঈল যে স্বপ্ন উপমহাদেশের মুসলিমদের দেখিয়েছিলেন তা এখনো অধরা রয়ে গেছে। আজকের এই দিনে বালাকোটের সেই হার না মানা সিংহ শার্দুলদের অদম্য সাহসিকতা আমাদের হৃদয়ে ভাস্বর হয়ে উঠুক, অটুট বিশ্বাস আর হিম্মত নিয়ে এগিয়ে চলুক ঈমানদাররা, তাদের স্বপ্ন পূরণে দৃপ্ত শপথ গ্রহণ করুক নওজোয়ানরা- এই প্রত্যাশায়।